

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ১০. ২. ১. যুদ্ধ বনাম সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা

কুরআন-হাদীসের উপরে আলোচিত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবী-তাবীয়াগণ ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণ সরকার পরিবর্তনের নামে বিদ্রোহ, আইন অমান্য, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতেন।

সাধারণভাবে এ মূলনীতির বিষয়ে সকলে একমত হলেও, প্রথম যুগের কয়েকটি যুদ্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি হলো, সাহাবীগণের যুগে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধ, ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা)-এর যুদ্ধ এবং মারওয়ান ও আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর যুদ্ধ। তাবীয়া ও তাবিতাবীয়াগণের যুগে আব্দুল মালিকের (খিলাফাত ৬৫-৮৬) বিরুদ্ধে আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আস'আসের (৮৫ হি) বিদ্রোহে তাবীয়া সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৪ হি) ও অন্যান্য কতিপয় তাবীয়ীর অংশগ্রহণ, উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের পৌত্র যাইদ ইবনু আলীর (১২২ হি) যুদ্ধ, এবং আববাসী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে আলী (রা)-এর বংশধর, 'নাফস যাকিয়াহ' নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি-তাবীয়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৯২-১৪৭ হি)-এর বিদ্রোহ।

লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণের যুগের যুদ্ধগুলি কোনোটিই “সরকার পরিবর্তনের জন্য” বিদ্রোহ ছিল না এবং তারা “সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার” পরে সরকার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করেননি। মূলত এগুলি ছিল সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকারের আগে তার কাছে শরীয়ত নির্দেশিত দাবি-দাওয়া পেশ করতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধ, অথবা দুপক্ষেরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দাবির কারণে।

আলী (রা)-এর সাথে তালহা, যুবাইর, আয়েশা ও মুআবিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধ ছিল উসমান (রা)-এ হত্যাকারীদের বিচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা খারিজী সম্প্রদায়ের আলোচনায় বিষয়টি উল্লেখ করেছি। হাদীস ও ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আলীর বিরোধীরা সরকার অপসারণ বা ক্ষমতা দখলের জন্য যুদ্ধ করেননি। উপরন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ বর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল যুদ্ধের সময়ে বিবাদমান পক্ষগুলি শান্তি আলোচনা করে তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অতর্কিতে উভয় শিবিরের উপর হামলা শুরু হয়। উভয় পক্ষই মনে করেন যে, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণ করেছে। এতে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ এ সকল যুদ্ধের মধ্যে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের আবেগ ও হটকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল কারণে তৎকালীন পরিবেশে তারা যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হন নি।

ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রা) যুদ্ধাভিযান চালান নি। মুআবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দেন। ৬০ হিজরী সালে তাঁর

মৃত্যুর পরে ইয়াযিদ খিলাফতের দাবি করলে তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকার মানুষ তা মেনে নেন। পক্ষান্তরে মদীনার অনেক মানুষ, ইরাকের মানুষ এবং বিশেষত কুফার মানুষেরা তা মানতে অস্বীকার করেন। কুফার মানুষেরা ইমাম হুসাইনকে (রা) খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময়ে ইমাম হুসাইন (রা) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন।

কুফার লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে খলীফা হিসাবে বাইয়াত করে পত্র প্রেরণ করে। তারা দাবি করে যে, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করতে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। মদীনা ও মক্কায় অবস্থানরত সাহাবীগণ ও ইমাম হুসাইনের প্রিয়জনেরা তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বাধা আসলে ইরাকবাসীরা হুসাইনের পিছন থেকে সরে যাবে। সবশেষে হুসাইন (রা) কুফা গমনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কোনো সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেননি। তিনি তাঁর পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে কুফায় রওয়ানা হন। তিনি কুফাবাসীর বাইয়াতের ভিত্তিতে বৈধ শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে কুফা যাচ্ছিলেন।

ইমাম হুসাইনের আগমনের আগেই ইয়াযিদের বাহিনী কুফায় আগমন করে এবং কুফাবাসী হুসাইনের সমর্থন থেকে পিছিয়ে যায়। কুফার একটি বাহিনী কারবালার প্রান্তরে হুসাইনকে (রা) অবরোধ করে। হুসাইন (রা) তাদেরকে বলেন, আমি তো যুদ্ধ করতে আসি নি। তোমরা আমাকে ডেকেছ বলেই আমি এসেছি। এখন তোমরা কুফাবাসীরাই তোমাদের বাইয়াত ও প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেছে। তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমরা মদীনায় ফিরে যাই, অথবা সীমান্তে যেয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, অথবা সরাসরি ইয়াযিদের কাছে যেয়ে তার সাথে বুঝাপড়া করি। কিন্তু কুফার বাহিনী এতে সম্মত না হয়ে তারা হুসাইনের পরিবার ও সাথীদের উপর হামলা চালায় ও তাঁকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। ৬৪ হিজরী সালে ইয়াযিদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অধিকাংশ মুসলিম তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৭৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১০ বৎসর তিনি এভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

এ সময়ে ইয়াযিদের পরে তার পুত্র মুআবিয়া কয়েক দিনের জন্য এবং তারপর মারওয়ান ইবনু হাকাম এক বৎসর সিরিয়ায় শাসক হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬৫ সালে মারওয়ানের মৃত্যুর পরে তার পুত্র আব্দুল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ সময়ে ক্ষমতার উভয় দাবিদারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরীতে আব্দুল মালিকের বাহিনী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে পরাজিত ও নিহত করতে সক্ষম হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর সময়ে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের যুদ্ধগুলিও কোনো সুপরিচালিত বিদ্রোহ বা ‘ধর্মদ্রোহিতার প্রতিবাদে দীন প্রতিষ্ঠার’ চেষ্টা ছিল না। কখনো পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে, কখনো শাসকের অত্যাচারে হয়ে বাধ্য হয়ে এবং কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজের অধিকারকে বৈধ মনে করে এ সকল যুদ্ধ হয়েছে। এগুলিতে অতি সামান্য সংখ্যক প্রসিদ্ধ আলিম জড়িত হয়েছেন বা সমর্থন করেছেন। তারা তা করেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আন্তরিকতা বা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ীর মত ও কর্মের বিপরীতে এগুলিকে দীনের প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার:

প্রথমত, মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে সে বিষয়ে কোনো আলিম বা বুজুর্গের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদ আর প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গণ্য হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে আলিম-বুজুর্গের কর্ম তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হয়, ভুল হলে তা অনিচ্ছাকৃত ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য হয় এবং কুরআন বা হাদীসের মূল নির্দেশনার উপর নির্ভর করতে হয়। এ বিষয়ে আমি “এহইয়াউস সুন্নাহ” গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[1]

দ্বিতীয়ত, সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মের ক্ষেত্রে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনো মত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তার বিপরীতে কতিপয় ব্যক্তির মত বা সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতার কারণে তাঁদেরকে দায়ী করা হয় না, কারণ মুজতাহিদের অধিকার আছে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কর্ম করার। কিন্তু পরবর্তীগণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটিই প্রামাণ্য বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, কোনো বিষয়ে যদি বৈধতা ও নিষিদ্ধতা দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নিষিদ্ধতার পালাকে ভারি করা হয়। কারণ ইসলামের মূলনীতি অনুসারে বৈধ বা জায়েয কর্ম পালন করার চেয়ে নিষিদ্ধ বা হারাম কর্ম বর্জন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় অন্যায়ে প্রতিবাদে আবেগী হয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন, আইন অমান্য বা বিদ্রোহ একদিকে যেমন কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ, তেমনি তাতে অকারণ রক্তপাত ও উম্মাহের জানমালের ক্ষতি ছাড়া দীনের কোনো রূপ লাভ হয় না। এজন্য তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিষয়টিকে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ (রাহিমাহুস্সল্লাহ) ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمرنا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافة ... والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما

“আমরা কেবলাপন্থী সকল নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং তাদের মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করা বৈধ মনে করি। আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করি না। তাদের কারো উপর কুফরী, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না, যতক্ষণ না এরূপ কিছু তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবে। তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আমরা আল্লাহ তা‘আলার উপর ছেড়ে দিই। উম্মাতে মুহাম্মদ (ﷺ)–এর কোনো লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ (জিহাদ, হত্যা বা শক্তিপ্রয়োগ) আমরা বৈধ মনে করি না, তবে যদি (রাষ্ট্রীয় বিচার বা জিহাদের মাধ্যমে) কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার অত্যাৱশ্যকীয় হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তগণ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ

মনে করি না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া বা অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয়। আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু‘আ করি। ... মুসলিম শাসক- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- তার অধীনে হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটকে বাতিল বা ব্যাহত করবে না।”[2]

ফুটনোট

[1] এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৯৪-১০৮।

[2] আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ১৫-১৬।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6933>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন